বাউল-ফকির উৎসব
১০.১০.২০১০

সাক্ষাৎকার
(তানভীর মোকাম্মেল)

প্রশ্ন : ১ **বাউল-ফকির ধর্ম বা সংস্কৃতি বা দর্শন যাই বলুন না কেন-- সে বিষয়ে আপনি দুটি ছবি করেছেন। স্বল্পদৈর্ঘ্যের *"অচিন পাখী"* ও পূর্ণদৈর্ঘ্যের *"লালন"*। ছোটবেলা থেকেই কি আপনি এই সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন? আপনার পঞ্চাশোর্ধ্ব জীবনে এই সংস্কৃতি ও দর্শনের অভিঘাতগুলি কিভাবে এসেছে তা বিস্তৃতভাবে জানার বড় ইচ্ছে হয়।**

উত্তর : বাল্য-কৈশোরে ট্রেনে-বাসে বা নিম্নবর্গের মানুষদের মুখে এসব গান শুনতাম। খুলনার মতো মফস্বল একটি শহরে বেড়ে ওঠার ফলে এসব গান শোনার সুযোগ বেশী ছিল। তাছাড়া বাংলাদেশের বাউল-ফকিরদের প্রধান কেন্দ্র কুষ্টিয়া জেলা খুলনা থেকে বেশী দুরেও নয়। বাউল-ফকিরদের গান তাই অল্পবয়স থেকেই শোনা হোত ও ভালো লাগত।

তবে খুব সচেতন আগ্রহটা সৃষ্টি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে, এবং বিশেষ করে, বিশ্ববিদ্যালয়-উত্তর জীবনে যখন রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কাজে আমাকে কুষ্টিয়া-যশোর অঞ্চলে ও পদ্মার চরগুলিতে অনেক ঘুরতে হয়েছে। তখনই আমি প্রত্যক্ষভাবে বাউল-ফকিরদের সংস্পর্শে এসেছিলাম। বুঝতে পারি যে সমাজের নীচুতলার মানুষদের উপর তাঁদের গান ও দর্শনের প্রভাবটা কত গভীর। তাদের গানে প্রাতিষ্ঠানিক ঈশ্বর ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগ্রন্থগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে উপাদানগুলি ছিল তা আমাকে খুবই আকর্ষণ করত।

আমার জীবনে যে কয়েকজন মানুষ আমাকে বাউল-ফকিরদের গানের গভীর তাৎপর্য্য, তাঁদের দর্শন ও সাধনার নিগূঢ় রূপটা বুঝতে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে সবচে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন মহিন শাহ। মহিন শাহ ছিলেন লালন ফকিরের প্রশিষ্যের প্রশিষ্য। গভীর লোকজ প্রজ্ঞা ও সহজাত সঙ্গীতপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন মহিন শাহ। আমি যখন ***'অচিন পাখী'*** ছবিটির গবেষণার কাজে কুষ্টিয়ায় যেতাম তখন মহিন শাহর সঙ্গে, বয়সের ব্যবধানটা ছাপিয়েই, আমার এক গভীর সখ্য গড়ে ওঠে। ওঁর সঙ্গে পদ্মার চরে চরে আমি অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি। মহিন শাহ্ আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর এসব অঞ্চলে ছড়ানো ওঁর ভক্ত-শিষ্যদের বাড়ী। অনেক সাধুসঙ্গে ওঁর সঙ্গে গেছি। বাউল-ফকিরদের সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তখন থেকেই আমার সৃষ্টি হয়েছে। ওঁদের গান ও সাধনার গোপন রহস্যগুলো বুঝতে সুবিধা হয়েছে। আরেকজন মানুষও আমাকে বাউলতত্ত্ব, ফকিরী মতবাদ, বিশেষ করে লালন ফকিরের জীবন ও দর্শন সম্পর্কে জানতে প্রভূত সহায়তা করেছেন। তিনি ছেঁউড়িয়ানিবাসী প্রবীন সাধক ফকির বাদের শাহ। লালনপন্থীরা যে মূলত: ফকির, বাউল নন, একথা বাদের শাহ-ই আমাকে বারেবারে বুঝিয়েছেন।

আজ এই পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে বাউল-ফকিরদের সম্পর্কে আমার উপলব্ধি হচ্ছে শিল্প-সাহিত্যে ভালো অবদান থাকলেও সাধারণভাবে বাঙ্গালীর দর্শনচিন্তা সীমিত ও দূর্বল। দর্শনের গভীর বিষয়গুলো নিয়ে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীরা তেমন কোনো মৌলিক বা গভীর বক্তব্য তুলে ধরতে পারেননি। বাঙ্গালীর সংস্কৃতিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত দরিদ্র এসব বাউল-ফকিররাই আসলে সবচে গভীরভাবে মানুষের সৃষ্টি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, মানব-জীবনের এসব নানা মৌলিক ও নিগূঢ় বিষয় সম্পর্কে কিছু গভীর দার্শনিক প্রশ্ন তুলেছেন এবং তাঁদের

নিজেদের মতো করে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছেন। তাঁদের দর্শনের সঙ্গে কেউ একমত না হলেও এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না তাঁদের দর্শনটা বেশ মৌলিক, এবং মানবদেহকে সবকিছুর কেন্দ্রে রাখার ফলে, গভীরভাবে মানবতাবাদী। ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রভাবমুক্ত এ এমন এক মানবতাবাদ যার অস্তিত্ব বাংলার লোকজ জীবনের গভীর শেকড়ে প্রোথিত। বাউল-ফকিরেরা বাঙ্গালী সংস্কৃতির এই গভীর ও প্রগাঢ় মানবতার দিকটির ব্যাপারে আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। তার জন্যে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

তরুণ বয়সে আমি জীবন শুরু করেছিলাম একজন মার্কসবাদী হিসেবে। সব ধরণের ভাববাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদী দর্শনটাই ছিল আমাদের জীবনের অন্বিষ্ট। কিন্তু বাউল-ফকিরদের দর্শনের গভীরে ঢুকে ক্রমশ: বুঝতে পারি যে তাঁরা সর্ব অর্থেই 'বস্তুবাদী'! এবং মানবদেহকেন্দ্রিক তাদের এই বস্তুবাদী দর্শনকে রক্ষার জন্যে যুগে যুগে রাষ্ট্রশক্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে তাঁরা কম লাঞ্ছিতও হননি। তাঁদের মত করেই তারা বিপ্লবী-- মানবতার বিপ্লবী। প্রকৃত বাউল-ফকির সাধকদের প্রতি তাই আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে।

আর লালন ফকিরকে যত জেনেছি ততই মুগ্ধ হয়েছি গভীর সব তত্ত্ব কথা খুবই সহজভাবে বলতে পারার ওঁর অসামান্য দক্ষতা এবং গান রচনার ওঁর সহজাত প্রতিভা দেখে। আমি মনে করি লালন ফকির হচ্ছেন বাংলার লোকজ সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ফুল। রবীন্দ্রনাথের মতই লালনের গান, এই পরিণত বয়সে, আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। আমার নিজের জীবনে প্রেমে, দ্রোহে, বেদনায়, সঙ্কটে এঁদের দু'জনের গান থেকেই আমি অনুপ্রেরণা পাই। প্রথম দিকে লালন ফকিরের গানের প্রতি আমি আকর্ষিত হয়েছিলাম মূলত: ওঁর গানের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের কারণে। বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে এই সাম্প্রদায়িক-অসাম্প্রদায়িক বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশে অসাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠার আমাদের সংগ্রামে লালন ফকিরকে হাতিয়ার হিসেবে পাওয়ার লক্ষ্যেই আমি তরুণ জীবনে লালনের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলাম। পরে অবশ্য ওঁর গানের ও সাধনার গভীরতর দিকগুলি ক্রমশ: আমার কাছে ধরা পড়ে।

প্রশ্ন : ২ আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার সময় মনে হল, এখান থেকে কিছু একটা বের হতে পারে। আপনার কি সেই দিনটির কথা মনে পড়ে যেদিন আপনার একথা মনে হয়েছিল?

উত্তর : সঠিক দিনটির কথা বলা কঠিন। তবে তরুণ বয়সের এটা এক উপলব্ধি ছিল যে বাংলার বাউল-ফকিরেরা এমন এক লোকজ ঐতিহ্যের অধিকারী যা সুগভীর ও শিল্পিত। তখনও কিন্তু তাঁদের সাধনার "বস্তুবাদী"(!) করণ-কারণ সম্পর্কে আমার খুব একটা স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। সেসব জানলাম যখন ওঁদেরকে নিয়ে ছবি তৈরী করার লক্ষ্যে ভালোভাবে গবেষণা শুরু করলাম।

প্রশ্ন : ৩ বাউল-ফকির নিয়ে ছবি করার কথা কবে কীভাবে প্রথম মাথায় এল?

উত্তর : আগে বলেছি যে আমি মার্কসবাদী হিসেবে জীবন শুরু করেছিলাম। সমাজ-বদলের রাজনীতি ছিল তরুণ বয়সে আমাদের সর্বক্ষণের ধ্যান-জ্ঞান। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রগতিশীল রাজনীতির প্রথম বাঁধাটাই আসে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রশক্তি ও শাসকশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক দর্শনের কাছ থেকে। তাই এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে একটা পাল্টা দর্শন হিসেবে লালনকে তুলে ধরাটা ছিল বাউল-ফকিরদের নিয়ে আমার প্রথম ছবি ***'অচিন পাখী'***-র প্রাথমিক উদ্দেশ্য। ধর্ম-বর্ণ-জাতি এসবের উর্ধ্বে সর্বমানবিকতার যে দর্শনটি বাউল-ফকিরদের আছে, সেটা তুলে ধরাটাই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু গবেষণার আরো গভীরে ঢুকে এবং বাউল-ফকিরদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে, বিশেষ করে মহিন শাহ-বাদের শাহ এসব তাত্ত্বিক গুরুদের সাহচর্য্যে থেকে আমি বুঝতে পারি যে অসাম্প্রদায়িকতাই লালন ফকিরের গানের একমাত্র প্রগতিশীল দিক নয়। লালন

ফকিরের সাধনা ও দর্শন আরো অনেক গভীর। সৃষ্টিতত্ত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েই তাঁর নানা প্রতিবাদী জিজ্ঞাসা। এক গভীর লোকজ দার্শনিক তিনি। আর সে দর্শনের ভিত্তিটা হচ্ছে-- দেহকেন্দ্রিক বস্তুবাদ। বাংলার মধ্যবিত্ত জগতে দর্শনচর্চার দৈন্যতা আছে। লালন ফকিরের মত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরের এক মানুষের মধ্যে সেই দর্শনচর্চার গভীরতা ও অর্জন দেখে আমি মুগ্ধ হই। তাই ঠিক করি, প্রথমে লালন ফকিরের জীবন ও দর্শন নিয়ে এই পরিচিতিমূলক প্রামাণ্যচিত্রটা বানাব-- ***'অচিন পাখী'***, এবং পরে সময়-সুযোগ মতো ওঁকে নিয়ে একটা পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরী করব-- ***"লালন"***। ***'অচিন পাখী'*** ও ***'লালন'*** ছবি দুটির চিন্তাটা আমার মাথায় এভাবেই এসেছিল।

প্রশ্ন : ৪ আপনি বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদে বিশ্বাস করতেন। আপনি যাঁদের কাছে গেলেন তাঁরাও বস্তুবাদী। তফাৎ কোথায়?

উত্তর : বাউল-ফকিরদের বস্তুবাদী সাধনার মূল কথাটা হোল-- মানবদেহ। *"যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে দেহভাণ্ডে"*-- তাঁদের দেহতত্ত্বের মূল বিষয়টাই হচ্ছে মানবদেহের রসরতির নানা অনুষঙ্গ। মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনেরও এক বড় কথা হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের বেচবার আর কিছু নেই, তাদের দেহজাত শ্রম ছাড়া। দুই ক্ষেত্রেই এই মানবদেহটাকেই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে যে মানবদেহ সব বস্তুবাদেরই মূল নির্যাস বলে আমি মনে করি। একজন মার্কসীয় বস্তুবাদী ও একজন ফকিরী মতবাদের বস্তুবাদী উভয়ের কাছেই এই মানবদেহ ও এই মানবজীবনের চেয়ে বড় কিছু নেই। ওই যে লালন বলেছিলেন *"এমন মানবজনম কী আর হবে/ মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে"*! বাউল-ফকিরেরা অনুমানে বিশ্বাস করেন না। তারা বর্তমানপন্থী। বাউল-ফকিরেরা যে পরলোকের চেয়ে বর্তমান জীবনটার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, এই ইহলৌকিকতা, ইসলাম-প্রভাবিত বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষদের জন্যে খুবই প্রয়োজনীয় একটা দিক বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। কারণ বর্তমান জীবনটাকে তুচ্ছ করে পরলোককে গুরুত্ব দেয়ার যে চেষ্টা ইসলামের ধর্মীয় এস্টাব্লিশমেন্ট করে থাকে তা আসলে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষকে ঠকানো ছাড়া আর কিছু নয়। মানবদেহ ও বর্তমান ইহজগতকে কেন্দ্রে স্থাপিত করে বাউল-ফকিরেরা সমাজ প্রগতির পক্ষে কাজ করছেন।

প্রশ্ন : ৫ সংগঠন কাকে বলে? গঠন আর সংগঠনে আপনি কোন তফাৎ পেয়েছেন? সেটা কি আপনি পেলেন কোনো বাউল-ফকিরের মাধ্যমে?

উত্তর : একটা সমাজবিপ্লব করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার লক্ষ্যে আমরা সংগঠন গড়েছিলাম। সে কাজে আন্তরিকভাবে একশ' ভাগ নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও আমার মনে এই দোলাচলটা ছিল, হয়তো সংবেদনশীল ছিলাম বলে যে, কোথাও যেন একটা গলদ রয়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের মেধা ও সংগঠন দক্ষতা দিয়ে গরীব মানুষদের কেবল দলীয় রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করছি না তো?! একটা অপরাধবোধ আমার মধ্যে কাজ করত।

বাউল-ফকিরদের ব্যাপারটা আলাদা। তাদের গঠন আর সংগঠন, যাই বলুন, তা তো ক্ষমতায়নের পথে যায়নি। মানবপ্রেমের পথে গেছে। আর লালন তো কোনো সংগঠনও নিজের জন্যে গড়েননি। কোনো গুরুপাঠও তিনি গড়ে তোলেননি। তিনি ছিলেন মূলত: একজন সাধক ও গীতিকার, একজন শিল্পী।

প্রশ্ন : ৬ একজন শিল্পী হিসেবে এই ছবি দু'টি করার সময় কী আপনার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল?

উত্তর : দুটি ছবির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের ব্যাপারে কিছু তারতম্য ছিল। বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের কাছে নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত লালন ফকির কেবল একটা নাম মাত্র ছিল। লালনের খুব অল্প সংখ্যক গানই সাধারণ মানুষ জানত। মূলত: ফরিদা পারভীন যেসব গান রেডিও-টেলিভিশনে বা ক্যাসেটে গেয়ে জনপ্রিয় করেছিলেন। ***'অচিন পাখী'*** প্রামাণ্যচিত্রটি তৈরীর সময় আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত লালন ফকিরকে জনগণের কাছে পরিচিত করানো, তাঁর জীবনের একটা রেখাচিত্র তুলে ধরা এবং লালন ফকির তথা বাউল-ফকিরদের দর্শন সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা।

আর ***'অচিন পাখী'*** প্রামাণ্যচিত্রটির প্রায় দশ বছর পরে যখন আমি ***'লালন'*** কাহিনীচিত্রটি তৈরী করতে নেমেছি ততদিনে গবেষণার ব্যাপারে আমি আরো অনেকটা এগিয়েছি। বাউল-ফকিরদের সঙ্গে আমার মেলামেশা ততদিনে আরো গভীরতর হয়েছে। আরো অনেককিছুই জেনেছি, নতুন করে কিছু বিষয় বুঝতে শিখেছি। এই সময়কালের মধ্যে লালন তথা বাউল-ফকিরদের নিয়ে বেশ কিছু ভাল গবেষণাকাজও বেরিয়েছিল। যেমন সুধীর চক্রবর্তীর কাজ, শক্তিনাথ ঝার কাজ, ক্যারল সালমন, জ্যাঁ ওপেনশ বা বাংলাদেশের আবুল আহসান চৌধুরীর কাজ। এসব গবেষণাকর্ম আমাকে লালন ফকিরের জীবন, তাঁর সময় ও সে যুগের প্রধান প্রধান দ্বন্দ্ব, লালনের অন্তর্নিহিত বেদনা ও ক্ষরণ এসব বুঝতে অনেকটা সহায়তা করেছে। বেশ কয়েকটা গানের ইঙ্গিতপূর্ণ দ্যোতক অর্থ আমার কাছে আরো পরিষ্কার হয়েছে। তাছাড়া যেহেতু ***'লালন'*** একটা কাহিনীচিত্র, ফলে লালন ফকিরের সঙ্গে লালনের সমসাময়িকদের আন্তঃসম্পর্ক, যেমন দুদ্দু শাহ ও কাঙ্গাল হরিনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, ঠাকুর-পরিবার, বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাথে তাঁর সম্পর্ক, মীর মোশারফ হোসেনের সাথে ওঁর সম্পর্ক, এসব বিষয় নিয়েও আমাকে গবেষণা করতে হয়েছে এবং ছবিটিতে সেসব চরিত্রকে দেখাতে হয়েছে। ফলে ***'অচিন পাখী'*** ও ***'লালন'*** ছবি দুটি নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিত ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেও কিছুটা ভিন্নতা ছিল।

প্রশ্ন : ৭ এই বিষয়ে ছবি করার সময়ে আপনি গবেষণার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রের ওপর বিশেষভাবে নজর দিয়েছিলেন?

উত্তর : বাউল-ফকিরদের ব্যাপারে আমার আগ্রহের মূল বিষয়টি ছিল-- দর্শনগত। আগেই বলেছি মানবদেহকেন্দ্রিক তাঁদের বস্তুবাদী দর্শনটি আমার বিশেষ আগ্রহের ক্ষেত্র ছিল। এছাড়া বাংলার সামাজিক ইতিহাসে বাউল-ফকিরদের স্থান এবং সবরকম ধর্মীয় ভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বাউল-ফকিরদের বলিষ্ঠ অবস্থানের দিকটিতেও আমার কৌতূহল ছিল। আর একজন শিল্পী হিসেবে আমার বিশেষ, বিশেষ আগ্রহ ছিল, তাঁদের গানের ব্যাপারে। বাউল-ফকিরদের গানের সম্ভার বাঙ্গালীর সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ সম্পদ। কোনো কোনো পদকর্তার, বিশেষ করে লালন ফকিরের গান রচনার সহজাত দক্ষতাটা আমাকে সবসময়ই গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে। কী অবলীলায়, কী অব্যর্থ সব শব্দ প্রয়োগ, যেমন ধরেন *'নিঃশব্দ শব্দ খাবে'* বা *'আঁখির কোণে পাখীর বাসা'* এ ধরণের বৈদগ্ধ্য তো আমরা অনেক সুশিক্ষিত কবিদের মাঝেও পাই না! আবার কত সহজ-সরল লোকজ সব চিত্রকল্পের মাধ্যমে লালন তাঁর দর্শনের গভীরতম দিকগুলিও ফুটিয়ে তুলতে জানতেন।

ভাষায় একান্ত গ্রামীণ কিন্তু চেতনায় গভীর দ্ব্যর্থবোধক নানা প্রতীক-উপমা ব্যবহার করে বাউল-ফকিরেরা তাঁদের গানকে দ্বি-স্তরবিশিষ্ট করতে জানতেন। এ সঙ্গীতপ্রতিভা আমি বলব গোটা

বিশ্বেই বিরল। ছবি দুটির গবেষণার ক্ষেত্রে তাই বাউল-ফকির তথা লালনের গানের বিষয়টি আমার বিশেষ অন্বিষ্ট ছিল। লালনের গানের মধ্য দিয়েই আমি লালন ফকিরকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। ***'লালন'*** ছবিটির চিত্রনাট্য লেখার সময় আমি লালন ফকিরের গানকেই তাই নানাভাবে ব্যবহার করেছি। কখনো গান হিসেবে, কখনো সংলাপের অংশ হিসেবে। আসলে লালন তো তাঁর জীবনদর্শনের কোনো লিখিত রূপ রেখে যাননি। তাঁর জীবনকাঠামোটাও কিছুটা ধোঁয়াশা। ফলে লালনের মনোজগতকে বুঝতে তাঁর গানই ছিল আমার কাছে একমাত্র উপাদান। ফলে ছবিটা তৈরীর সময় লালনের কয়েক'শ গানকেই আমি আমার গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছি।

প্রশ্ন : ৮ উপেন্দ্রনাথ ভট্টচার্য্য, আমাদের মতে, সকলের আগে বাউল-ফকির দর্শনের একটা জায়গাতে পৌঁছেছিলেন। উপেন্দ্রবাবুর কাজ কি আপনাকে কোনোভাবে প্রভাবিত করেছে?

উত্তর : বাউল-ফকিরদের নিয়ে গবেষণা শুরুর ক্ষেত্রে আমি প্রথম যে বইটি পড়ি তা উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের *'বাংলার বাউল ও বাউল গান'*। পরে হয়তো ওঁর বইয়ের চেয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যবহুল বই আরো বের হয়েছে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, উপেন্দ্রনাথ বাবুই বাংলার বাউল-ফকিরদের প্রতি এদেশের শিক্ষিত-সচেতন মানুষদের দৃষ্টি ফেরাতে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। ওঁর কাজের ব্যাপ্তি ও পরিধিটাও ছিল বিশাল। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর বই পড়ে উপকৃত হয়েছি।

প্রশ্ন : ৯ আর কাদের কাদের লেখা আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল?

উত্তর : বাংলায় যাঁরা লিখেছেন, যেমন সুধীর চক্রবর্তী, শক্তিনাথ ঝা, আবুল আহসান চৌধুরী। বিদেশীদের মধ্যে ক্যারল সালমন ও জ্যাঁ ওপেনশ'র লেখা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আশ্চর্য্য হলেও সত্য, লালনের কিছু গানের অর্থ বিদেশী গবেষকদের হাতেই বেশী পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। ওঁদের গবেষণার প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত এবং ওঁদের মেধা, শ্রম ও আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত।

এছাড়া রয়েছেন লন্ডনপ্রবাসী বাউল গানের সংগ্রাহক রঙ্গন মোমেন। উনি নিজে কিছু লেখেননি কিন্তু বাঙ্গালীদের মধ্যে বাউল-ফকিরদের সম্পর্কে সবচে তত্ত্বজ্ঞ একজন মানুষ হচ্ছেন রঙ্গন মোমেন। প্যারিসের দেবেন ভট্টাচার্য্যের পরেই যাঁর রয়েছে বাউল-ফকিরদের গানের সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালাটি। রঙ্গন মোমেনের সঙ্গে বাউল-ফকিরদের দর্শনতত্ত্ব ও গান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলাপ করে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি।

প্রশ্ন : ১০ বিদেশীরা দূর থেকে দেখছেন বলেই কী বুঝতে পারছেন বেশি?

উত্তর : দূরত্ব এক ধরণের নৈর্ব্যক্তিকতা দেয়, ভালো গবেষণার জন্যে যে নৈর্ব্যক্তিকতাটা প্রয়োজনীয়। তাছাড়া এটা আমার অভিজ্ঞতা যে পশ্চিমারা যে কোনো গবেষণা খুব গভীরে যেয়ে ও নিবিড়ভাবে করে। ওঁরা খুবই পরিশ্রমী এবং ওঁদের পদ্ধতিগুলিও বেশ বৈজ্ঞানিক।

প্রশ্ন : ১১ যেসব বাউল-ফকিরের সঙ্গে আপনি কথা বলেছিলেন তাঁদের কথা যদি সবিস্তারের বলেন।

উত্তর : অনেক বাউল-ফকিরের সঙ্গেই আমি কথা বলেছি। অনেকের সঙ্গেই দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তবে যাঁর নাম সর্বাগ্রে বলতে হয় তিনি-- ফকির মহিন শাহ। আগেই বলেছি মহিন

শাহ ছিলেন লালন ফকিরের প্রশিষ্যের প্রশিষ্য। দেশে-বিদেশে অনেক বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীর সাথে আমার মেশার সুযোগ ঘটেছে, কিন্তু মহিন শাহর মতো এরকম মেধাবী ও জীবনরসিক মানুষ আমি খুব বেশী দেখিনি। অথচ যাকে বলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তা তাঁর ছিল না। কিন্তু মহিন শাহর মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি বাংলার লোকজ প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ এক প্রকাশকে। লালন ফকিরের গভীরতা ও মেধার পরিমাণ দেখে মাঝে মাঝে আমার মনে বিস্ময় জাগত যে এ কী করে সম্ভব?! কোনো রকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই, মেধার এমন বিকাশ ও প্রকাশ কীভাবে সম্ভব? মহিন শাহকে দেখে আমি বুঝেছি যে তা খুবই সম্ভব। যে গভীর প্রজ্ঞার তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন তা হাজার বছরের লোকজ বাংলার প্রজ্ঞারই এক ধারাবাহিকতা। এর সঙ্গে মেকলে সাহেব প্রণীত প্রাতিষ্ঠানিক 'শিক্ষা'(!)-র কোনো সম্পর্ক নেই!

তো মহিন শাহর সঙ্গে আমি অনেক সময় কাটিয়েছি। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ওঁর সঙ্গে আমি পদ্মার চরে চরে অনেক ঘুরেছি। কুষ্টিয়া জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে ওঁর শিষ্য-শিষ্যাদের বাড়ীতে গেছি, থেকেছি। ওঁর সঙ্গে একাধিক সাধুসঙ্গে অংশ নিয়েছি। যেহেতু উনি আমাকে স্নেহ করতেন এবং কুষ্টিয়া-ফরিদপুর অঞ্চলের বাউল-ফকিরেরা মহিন শাহকে মানতেন একজন পরমশ্রদ্ধেয় গুরু হিসেবে, ফলে অন্যান্য বাউল-ফকিরদের কাছেও আমার দ্বার ছিল উন্মুক্ত। মহিন শাহ ঢাকায় এসে আমার বাড়ীতেও থেকেছেন। ঘরে, ট্রেনে, বাসে, নৌকায়, গরুর গাড়ীতে বাউল-ফকিরদের তত্ত্ব ও সঙ্গীত নিয়ে মহিন শাহর সঙ্গে আমার অনেক অনেক দিন আলাপ হয়েছে। কোনোদিন কথা বলতে বলতে গভীর রাতও হয়েছে। আমার হাজারো প্রশ্নের জবাব দিতে উনি ছিলেন অক্লান্ত। অল্প কথায় কোনো গভীর জিনিস খুব সহজে বোঝাতে পারতেন। কোনো তর্ক-বিতর্কেই উত্তেজিত হতেন না। প্রশ্নের জবাবে কেবল হয়তো একটা প্রবাদ বা প্রবচন বলতেন। কিম্বা স্মিতমুখে একতারাটা টেনে নিয়ে, ওটা ওঁর হাতের কাছেই সবসময় মজুদ থাকত, কখনো লালনের, বা কখনো অন্য কোনো পদকর্তার, একটা চরণ গেয়ে আমার প্রশ্নের জবাব দিতেন। অসামান্য মেধাবী, ব্যতিক্রমী এক মানুষ ছিলেন মহিন শাহ। ওঁকে দেখেই আমি বুঝেছি লালন ফকির কেমন হতে পারতেন। কেমন ছিলেন।

বাউল-ফকির দর্শনের আরেকজন তত্ত্বগুরু যাঁর সঙ্গে আলাপ করে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি তিনি বৃদ্ধ ফকির বাদের শাহ। ছেঁউড়িয়ানিবাসী বাদের শাহ লালনের আশ্রমের পাশেই থাকতেন। আজন্ম তিনি লালন ফকিরের গান ও তত্ত্ব নিয়ে সাধনা করে গেছেন। ওঁর অনেক ভক্ত রয়েছে। মাঝে মাঝে ভক্তদের নিয়ে সাধুসঙ্গ করতেন। আমি সেসব সাধুসঙ্গে অংশ নিয়েছি। বাদের শাহ আমাকে লালন ফকিরের জীবনী ও লালনের কিছু গানের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে এমন কিছু জানিয়েছেন যা আমি অন্য কোথাও পাইনি।

আরেকজন হচ্ছেন ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহ। মন্টু শাহই প্রথম লালনের গানের তিনটি সংকলন বের করেন যেখানে লালনের প্রাপ্ত গানগুলি রয়েছে। মন্টু শাহ ঠিক সঙ্গীতজ্ঞ নন, নিজে গান গান না। তবে উনি বাস করেন ছেঁউরিয়ায়, লালনের মাজারের পাশে এবং ওঁর গোটা জীবনটাই কেটেছে লালনচর্চায়। ফকির মন্টু শাহ আমার ঘনিষ্ঠজনদের একজন। ওঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেও লালন ফকির সম্পর্কে অনেককিছু জেনেছি। লালনের গান সংগ্রহের জন্যে ফকির মন্টু শাহ কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনা, রাজশাহী, ঢাকা, ফরিদপুর বা খুলনার এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে যাননি। চেনেন প্রায় সব বাউল-ফকিরদেরই। ওঁর মাধ্যমে আমি বাংলাদেশের বাউল-ফকিরদের অনেককেই ব্যক্তিগতভাবে চিনেছি। লালন-চর্চার মূল মূল ব্যক্তি ও কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

'অচিন পাখী' ও ***'লালন'*** এই দুটি ছবির ক্ষেত্রেই বাউল-ফকিরদের নানা বিষয় সম্পর্কে জানা-বোঝার ব্যাপারে বাংলাদেশের এই তিনজন প্রবীন লালনপন্থীর কাছ থেকে আমি অনেক উপকার পেয়েছি। তরুণদের মধ্যে ফকির বলাই শাহ আমাকে লালনভক্তদের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যেটা করেছেন কার্তিক দাস বাউল। কার্তিক বাউল আমাকে বীরভূম ও নদীয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ও আড়ংঘাটার বাউল-ফকিরদের আস্তানাগুলিতে নিয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : ১২ এই ঐতিহ্যের মধ্যে বহু আঞ্চলিক বৈচিত্র্য নজরে আসে। আপনি গবেষণার ক্ষেত্রে কী কোনো অঞ্চলের উপর জোর দিয়েছিলেন? দিয়ে থাকলে কী কারণে দিলেন?

উত্তর : আমি গবেষণার যত গভীরে গেছি ততই অনুধাবন করতে পেরেছি যে বাংলার বাউল-ফকিরদের মূলত: তিনটি কেন্দ্র রয়েছে। প্রথমত: বীরভূমকেন্দ্রিক একটা ধারা যেখানে দেহকেন্দ্রিক বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার একটা ছাপ রয়েছে। আরেকটি ধারা হচ্ছে নদীয়াকেন্দ্রিক, যেখানে শ্রীচৈতন্য বা ভক্তিবাদী আন্দোলনের ফলে স্বাভাবিক কারণেই সহজিয়া বৈষ্ণববাদের প্রভাবটা বেশী। আর একটি কেন্দ্র বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায়, মূলত: লালন ফকিরের আশ্রম ছেঁউড়িয়াকেন্দ্রিক। জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান বেশী বলেই হয়তো এখানে সূফী মতবাদের প্রভাবটাই বেশী।

আসলে বাংলার বাউল-ফকিরদের দর্শন তো এই তিনটি মতবাদেরই এক সংমিশ্রণ--বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা, বৈষ্ণব সহজিয়া ও ইসলামী সুফীবাদ। তো গবেষণার কাজে আমি এই তিন অঞ্চলেই অনেক ঘুরেছি। বাউল-ফকিরদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি। তাঁদের গান বারবার শুনেছি। তবে যেহেতু আমার দুটি ছবিরই বিষয়বস্তু মূলত: লালন ফকির, ফলে যে দুটি অঞ্চলে লালনের প্রভাব সবচে বেশী, সেই কুষ্টিয়া-যশোর-ফরিদপুর অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া-কৃষ্ণনগর-চব্বিশ পরগণা এসব অঞ্চলেই আমি বেশী কাজ করেছি। ***'অচিন পাখী'***-র শুটিং বাংলাদেশের কুষ্টিয়া ও পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে হয়েছে। তবে ***'লালন'*** ছবির ক্ষেত্রে শুটিং মূলত: বাংলাদেশের কুষ্টিয়া-যশোর অঞ্চলেই করা হয়েছে।

প্রশ্ন : ১৩ আপনি আমাদেরকে সিলেট, নেত্রকোনা এসব ভাটি অঞ্চলের বাউল-ফকিরদের সম্পর্কে কিছু বলবেন কী?

উত্তর : সিলেট ও নেত্রকোনার ভাটি অঞ্চলে মরমী গানের এক বিশাল ঐতিহ্য রয়েছে। এ ধারার এক বড় প্রকাশ আমরা দেখি হাছন রাজার মধ্যে। এছাড়া রয়েছেন রাধারমন এবং ফকির শাহ্ আবদুল করিম। এঁদের কাজ আমাকে অনুপ্রাণিত করে।

নেত্রকোনার হাওড় অঞ্চলের পুরোটাই মরমী গানের এক উর্বর ক্ষেত্র। রয়েছেন সাধক জালাল খাঁ, উকিল মুনশি, সাধক দ্বীন শরত বা অন্ধ সাধক তৈয়ব আলী। এঁদের সবার কাজই মনোযোগের দাবী রাখে।

প্রশ্ন : ১৪ যে অঞ্চলগুলিতে আপনার ছবি দুটির শুটিং হয়েছিল সেসব জায়গার লোকদের কী ছবি দুটি দেখানোর কোনো ব্যবস্থা আপনি করতে পেরেছিলেন? হলের দর্শকের বাইরে স্থানীয় মানুষদের প্রতিক্রিয়া কী আপনার জানার সুযোগ হয়েছিল?

উত্তর : যেহেতু লালন ফকিরের আশ্রম কুষ্টিয়ায় এবং বাংলাদেশের লালনবাদীরা মূলত: কুষ্টিয়াকেন্দ্রিক, ফলে আমার দুটি ছবিই, ***'অচিন পাখী'*** ও ***'লালন',*** কুষ্টিয়াতে দেখানো হয়েছে। এ অঞ্চলের মানুষেরা ছবি দুটি সহজেই বুঝতে পেরেছেন এবং উপভোগ করেছেন। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে, যেখানে লালন ফকির, বা সামগ্রিকভাবে বাউল-ফকিরদের সম্পর্কে জানাশোনা কম, সেসব অঞ্চলে ছবি দুটি হয়তো তেমন অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি। অনেক কিছুই তাঁদের বোঝার বাইরে রয়ে গেছে। একই বিষয়টা ঘটেছে ঢাকাকেন্দ্রিক ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর ক্ষেত্রে। লালনের গান বলতে বাংলাদেশের মুসলিম সুবিধাভোগী শ্রেণীটা মূলত: বোঝেন মন-উদাস-করা এক রকম গান যেগুলো ফরিদা পারভীন ও অন্যান্য মধ্যবিত্ত শিল্পীরা রেডিও-টেলিভিশন বা ক্যাসেট-সিডির মাধ্যমে জনপ্রিয় করেছেন। লালন ফকির তথা বাউল-ফকিরদের বিচিত্র জীবনদর্শন সম্পর্কে এসব দর্শক-শ্রোতা সামান্যই জানেন। আমাদের ছবিতে সেসব দেখে তাঁরা কিছুটা ধাক্কা খেয়েছেন। আসলে এসব গানের প্রকৃত গভীরতা অনুধাবন করার মানসিক বিকাশের পর্যায়ে এখনও বাংলাদেশের উঠতি ধনিকশ্রেণীটা নেই। শ্রেণীটা এখনও ধনসম্পদ সংগ্রহ বা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায়। মাঝে মাঝে লালন বা হাছন রাজার মন-উদাস-করা গান তাদের ভালো লাগে বটে, তবে লালনের গানের বাণীর গভীরে ঢোকার মেধা ও মানসিকতার ঘাটতি আছে তাদের মধ্যে।

অজানার ব্যাপারটা পশ্চিম বাংলার দর্শকের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। 'বাউল' সম্পর্কে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত মানসে যে একটা রোমান্টিক নির্মাণ রয়েছে, যা সৃষ্টিতে প্রথম জীবনের রবীন্দ্রনাথেরও কিছুটা ভূমিকা রয়েছে, বাস্তবের বাউল-ফকিরেরা তো সেকরম নয়। তাঁদের সঙ্গে যাঁরাই ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন তাঁরাই সেটা জানেন। তাঁদের 'বস্তুবাদী' দর্শন মধ্যবিত্তদের সংবেদনশীলতাকে বরং আঘাতই করে! তাছাড়া আমার ***'লালন'*** ছবির ফকিরেরা সব সাদা পোশাক পরে। ছেঁউড়িয়ার লালনপন্থীদের এটাই রীতি। ভেক-খিলাফত নেবার পর সবার পোশাকই সাদা যা কাফনের কাপড়ের রং। এখন পশ্চিম বাংলার দর্শকেরা যেসব বাউলদের দেখতে অভ্যস্থ তারা তো উজ্জ্বল রঙীন কাপড় পরে! ছবিটার ক্ষেত্রে এই পোশাকের ব্যাপারটাও পশ্চিমবঙ্গের দর্শকদের সাথে একটা দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া সূফী মতবাদ প্রভাবিত ফকিরদের আচার-অনুষ্ঠানের কিছু ভিন্নতা রয়েছে পশ্চিম বাংলার বাউলদের আচাররীতির সঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের দর্শকেরা সেসব আচাররীতির সঙ্গে তেমন পরিচিত নন।

প্রশ্ন : ১৫ আজকের বাংলাদেশে বাউল-ফকির সমাজের ভবিষ্যৎ কী? তাদের উদ্বেগ বা আশার কারণগুলি কি কি?

উত্তর : সত্যি বলতে কী, আজকের বাংলাদেশে গায়ক বাউল-ফকিরদের কিছুটা ভবিষ্যৎ থাকলেও, সাধক বাউল-ফকিরদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের সমাজে ইসলামীকরণ যেভাবে বেড়েছে, ইসলামী মৌলবাদী ধ্যান-ধারণা ও ওয়াহাবীদের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিগুলো যেভাবে মসজিদকেন্দ্রিক গ্রাম-বাংলায় জেঁকে বসেছে, তাতে বাউল-ফকিরদের প্রতিষ্ঠানবিরোধী জীবনচর্চা ক্রমশ:ই আক্রান্ত হতে থাকবে। মূলত: এ আক্রমণটা আসছে, আসবে, শাসকশ্রেণীগুলো থেকে বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে। ফলে তার বিরুদ্ধে প্রকৃত সাধক-বাউল ফকিরদের টিঁকে থাকাটা কঠিন হবে।

তাছাড়া অতীত যুগে গ্রাম-বাংলার সমাজ নানা দান-অনুদানের মাধ্যমে এসব বাউল-ফকিরদের লালন করত। বাংলাদেশের মসজিদকেন্দ্রিক সুন্নী ইসলামপ্রভাবিত গ্রামসমাজ, এখন আর সেই মানসিকতায় নেই। বাংলাদেশের বাউল-ফকিরদের নিয়ে আমি তাই কিছুটা উদ্বিগ্ন।

আর রেডিও-টেলিভিশন এসবের কারণে যেসব গায়ক বাউল-ফকির ক্রমশ: জনপ্রিয়তা পাচ্ছে, তারা ধণিক শ্রেণী বা শহুরে মধ্যবিত্তদের মধ্যে হয়তো প্রতিষ্ঠা পাবে, কিছু অর্থ-যশ, বিদেশ ভ্রমণ এসবও হয়তো জুটবে, তবে এর ফলে তাদের গ্রামীণ শেকড়ের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বাড়তে বাড়তে তারা একসময় পরিণত হবে কেবলই জনপ্রিয় লোকগায়কে। বাউল-ফকিরদের প্রকৃত সাধনা ও জীবনচর্চার সঙ্গে তাদের আর সম্পর্ক রইবে না। যেরকম কিছু উদাহরণ আমরা পশ্চিমবঙ্গে হয়তো ইতিমধ্যে দেখেছি! বাংলাদেশেও সেটা ঘটছে। তবে যেহেতু এই দর্শনটি বা এই ধারাটি বাঙ্গালী সংস্কৃতির গভীরতর উপাদানগুলির সঙ্গে জড়িত ফলে বাউল-ফকিরেরা কোনোসময়েই একেবারে হারিয়ে যাবে না।

প্রশ্ন : ১৬ ঢাকা শহর কি আসলে 'ঢাকা শহর'? মানে আমাদের প্রশ্ন এরা কীভাবে থাকবে?

উত্তর : বছর বিশেক আগেও ঢাকা ছিল মফস্বলী একটা বড় শহর। কিন্তু একটা স্বাধীন দেশের রাজধানী হওয়াতে ও সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের প্রভাবে শহরটি জনসংখ্যা ও আকারে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়ছে। প্রায় ডায়নোসোরের আকারেই তার বৃদ্ধি ঘটছে! শহরটির নিজস্ব সাংস্কৃতিক চরিত্র তাই বেশ বড় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। শহরটিতে একটা জঙ্গমতা রয়েছে এবং এখানে বৈষয়িক সমৃদ্ধি কিছু বাড়লেও সূক্ষ্মতার চর্চা বেশ কমে গেছে। বাউল-ফকিরেরা এখানে অপাংক্তেয় না হলেও তাদের অবস্থানটা হয়ে পড়ছে অনেকটা শো-পীসের মতো। ঢাকা শহরের এলিট ও ক্ষমতাবানদের এখন যে মানসিকতা তা ঠিক বাউল-ফকিরদের ধারণ করার অনুকূলে নয়। তবে এ শহরের মধ্যবিত্ত তরুণ এবং বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে বাউল-ফকিরদের গানের একটা ভালো গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

প্রশ্ন : ১৭ যেহেতু আপনি এপার বাংলায় নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন তাই জিজ্ঞেস করি পশ্চিম বাংলায় অবস্থা কী কোনোভাবে আলাদা?

উত্তর : বেশ আলাদা। আমি যেসব জায়গায় গেছি, বীরভূম বা নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে, সেখানে লক্ষ্য করেছি যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-বাংলার সমাজ এখনও বাউল-ফকিরদের ধারণ করতে, লালন করতে ইচ্ছুক ও সক্ষম। তাছাড়া কলকাতার বিদগ্ধজনদের মধ্যে অনেক মানুষ আছেন যাঁরা বাউল-ফকিরদের দর্শন ও জীবনধারণ সম্পর্কে যথেষ্ট জানেন এবং তাদের দ্ব্যর্থবাধক গানের অর্থ তাঁরা বোঝেন ও উপভোগ করেন। বাংলাদেশে অবস্থা ঠিক তেমনটি নয়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ বাংলাদেশ থেকে অনেক গভীর। ধর্মীয় মৌলবাদ পশ্চিমবঙ্গে দূর্বল। ফলে পশ্চিমবঙ্গে বাউল-ফকিরদের গ্রহণযোগ্যতা বেশী এবং তাঁদের টিঁকে থাকার ও বিকশিত হবার সম্ভাবনাও অনেক বেশী।

= 0 =